MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা
নভেম্বর ২০২২
দাম : দশ টাকা

বিপ্লবের জন্য উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র নির্ণয় এবং সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ জরুরি

[২৯ ও ৩০ জুলাই '২২ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের ৬ নং জোনের দুই দিনব্যাপী শিক্ষা শিবির আলী আহাম্মদ চুনকা পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা শিবিরের বিষয় ছিল বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র। সেই শিক্ষাশিবিরে বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের বক্তব্য ঈষৎ সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হল।]

উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র জানা প্রয়োজন কেন? আমাদের দল বাসদ বাংলাদেশে সমাজ বিপ্লব করতে চায়, সেই বিপ্লবের জন্য যে রণনীতি ও রণকৌশল ঘোষণা করেছে, সেটা দল প্রকাশিত উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রচরিত্র বইটিতে আছে। আমরা বলেছি রাষ্ট্রটা পুঁজিবাদী, বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক। বুর্জোয়া শ্রেণিকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে। গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে বিপ্লবের দোলায়মান মিত্র হিসেবে উদার গণতন্ত্রী ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিকে সাথে নিয়ে এগোতে হবে। এভাবে আমরা বিপ্লবটা সম্পন্ন করতে চাই। কালের বিবর্তনে সংগ্রামের রূপ পাল্টাবে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের আগে পর্যন্ত। তাই প্রকৃত মুক্তি অর্জনের সংগ্রাম গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম দরকার নির্দিষ্ট সময়ের শোষণের স্বরূপ এবং তার শ্রেণি ভিত্তিটি জানা। যে কোন বিপ্লবের বিজয়ের জন্য দরকার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ এবং বিরাজমান পরিস্থিতিতে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করা অর্থাৎ বিপ্লবী লড়াইয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের সঠিক লাইন নির্ধারণ করার প্রশ্নটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লড়াই যতই হোক সঠিক রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলের নেতৃত্বে তা পরিচালিত না হলে, জনগণের সংগ্রাম কখনই তার ঈপ্সিত মুক্তি তথা বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। এক কথায় বলতে গেলে দেশে বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণের প্রশ্ন। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি ও তার নিরিখে শ্রেণিবিন্যাসকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রচরিত্র নির্ধারণ করতে হবে। বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের প্রশ্নেও রাজনৈতিক দিক থেকে শ্রেণিবিন্যাসকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ আমরা সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চাই। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন আমরা নির্ধারণ করেছি,অন্যান্য বামপন্থি দলগুলো বিশেষত, ট্রেডিশনাল কমিউনিস্ট পার্টি, পিকিং ও মস্কোপন্থি পার্টি-তারা সবাই বিপ্লবের ভিন্ন ভিন্ন স্তর নির্ধারণ করেছে। কেউ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তর-যেটা বাস্তবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, কেউ নির্ধারণ করেছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, এটাকে নয়া

গণতান্ত্রিক বিপ্লবও বলা হয়। বিপ্লবের লাইন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজটা কেমন, রাষ্ট্রের চরিত্র কেমন তার উপর নির্ভর করেই বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হয়। সামন্তবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে বুর্জোয়াশ্রেণি সামন্ত-রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে বিপ্লব করেছিল তার নাম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেমন, ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েল বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, জাপানের মেইজি বিপ্লব ইত্যাদি। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে, অন্যদেশ দখল করছে, তখন সেই দেশসমূহের বুর্জোয়াশ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা এবং সামন্তবাদ উচ্ছেদ করে স্বাধীন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে বিপ্লব করেছে তাকে বলা যায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেমন, আমেরিকা, আলজেরিয়া, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি। কমরেড লেনিন দেখিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণির নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোনটাই পূর্ণতা পেতে পারে না। তাই বিপ্লব হবে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে এই বিপ্লবের নাম হবে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। যেভাবে চীনে মাও সেতুং নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবটা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে হবে। পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের এইকালে এ দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণিকে নিতে হবে, সেখান থেকে আসছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। চীনের যে বাস্তবতা ছিল সেখানে একটা অংশ ছিল জাপান-মার্কিনসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে, অন্য এলাকায় চলেছে সামন্ত প্রভু জমিদারদের শাসন, ফলে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী শক্তির নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ দুটাকে উৎখাত করে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। এখানে শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজগুলো সম্পূর্ণ করে সমাজতন্ত্র কায়েম করবে। আবার রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয়েছে সেটা ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কারণ, রাশিয়ায় সামন্ত জার সরকারকে উচ্ছেদ করে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বুর্জোয়া সরকার ক্ষমতায় আরোহণের পর ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। এই সকল ধরনের বিপ্লবের মধ্যে কতগুলো পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যগুলো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই জন্যই আমরা উৎপাদন পদ্ধতি ও রাষ্ট্র চরিত্র বিষয়ে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমাদের প্রতিদিনের আন্দোলনের দাবি-কর্মসূচি নির্ধারণ, শত্রু-মিত্র যাচাই করা ইত্যাদির জন্য যেমন এই আলোচনা বোঝা জরুরি আবার অন্যদিকে বিভিন্ন পার্টির সাথে মতবাদিক সংগ্রামের জন্যও এটা বোঝা জরুরি। ইতিপূর্বে অন্যান্য পার্টিগুলো আমাদের দলের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছে বিভিন্ন সময়ে। অনেকে বলেছে আমরা এক লাফে গোড়া থেকে গাছের মাথায় উঠতে চাই, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হলে যে ঐতিহ্যগত ধারণা আছে, যে বুর্জোয়াশ্রেণির অর্থাৎ পুঁজির বিকাশ ঘটাতে হবে এবং একটা ক্লাসিকাল সর্বহারা শ্রেণির বিকাশ ঘটাতে হবে, এরপরেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে।

এই বিতর্ক রাশিয়াতেও ছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়াতে জার সরকার উৎখাতের পর বুর্জোয়া ও জমিদারদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত কেরেনেস্কির সরকার ক্ষমতায় বসে। যার মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল। বিপ্লবের এই লড়াইয়ে বলশেভিক, মেনশেভিক ও অন্যান্য সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলোও ছিল। মেনশেভিক তো বটেই বলশেভিক পার্টির মধ্যেও তখন বিতর্ক ছিল যে সামন্ত প্রভুদের উচ্ছেদ করে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে। এখন বুর্জোয়াশ্রেণিকে পুঁজি এবং শিল্প কলকারখানার বিকাশ সাধন করতে হবে। তাই বুর্জোয়া সরকারকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। এই ধরনের চিন্তা যখন চলছে তখন লেনিন দেশের বাইরে ছিলেন। তিনি রাশিয়ায় এপ্রিল মাসে ফেরার পথে ফিনল্যান্ড সীমান্তে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, এখন আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে হবে। বুর্জোয়া কেরেনেস্কি সরকারকে সহযোগিতা বা তার সাথে কাজ করা নয় বরং বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণি তথা সোভিয়েতের হাতে নিয়ে আসতে হবে। এরপর বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায়ও ঐ বিষয়ে আলোচনা হয় যেটা তার বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস' হিসেবে পরিচিত। এখানেই লেনিন আলোচনা করেছেন, বলশেভিকদের লক্ষ্য কী হবে, রণনীতি-রণকৌশল কী হবে? তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে রাষ্ট্র ক্ষমতা পুরোনো শ্রেণির হাতে ছিল, অর্থাৎ নিকোলাস রোমানভের রাজত্বে অভিজাত সামন্ত ভূস্বামী শ্রেণির হাতে। বিপ্লবের পরে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে, নতুন শ্রেণি অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণির হাতে গিয়েছে। এক শ্রেণির হাত থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা অন্য শ্রেণির হাতে যাওয়া হচ্ছে বিপ্লবের প্রথম, মুখ্য এবং মৌলিক লক্ষণ। বিপ্লবের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা-দুই অর্থেই। ততদূর পর্যন্ত রাশিয়ায় বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। বলশেভিকদের একটা অংশ মনে করতেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পুঁজিবাদ সে মাত্রায় বিকশিত ও সে স্তরে উন্নীত হয়নি। তা ছাড়া বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ হলেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের করণীয় অনেক কাজ এখনো বাকি আছে। তাদের যুক্তি ছিল এইসব অপূরিত কাজ সমাপ্ত না করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কীভাবে সম্ভব অর্থাৎ তাদের দ্বিধা তখনও কাটেনি। তাদের প্রশ্নের মীমাংসা হয় লেনিন নির্দেশিত এপ্রিল থিসিসের মাধ্যমে। এই বিষয়টা স্পষ্ট করতে লেনিন বললেন, প্রত্যেক বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্ন হলো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। এই প্রশ্ন না বুঝলে বিপ্লবে বুদ্ধিমত্তার সাথে অংশগ্রহণ হতে পারে না, নেতৃত্ব দেওয়ার কথা তো বলাই চলে না। তখন বলা হয়েছে বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত হয় শাসন ক্ষমতায় কোন শ্রেণি আছে প্রধানত তাদের চরিত্র দিয়ে। বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের প্রশ্নে মার্কস এর যে ক্লাসিকাল ব্যাখ্যা, বুর্জোয়ার বিকাশ ঘটাতে হবে, শিল্প কারখানার বিকাশ ঘটাতে হবে, শ্রেণি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের বিকাশ ঘটাতে হবে এবং একটা পর্যায়ে গেলে যে বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হবে তখন সেটাকে

কাজে লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। লেনিন এখানে তার বক্তব্য উপস্থাপিত করে বলেন, 'বিপ্লবের প্রথম স্তরে বুর্জোয়াশ্রেণির হাতে ক্ষমতা আসে, সেখান হতে দ্বিতীয় স্তরে নিশ্চিতভাবেই সর্বহারাশ্রেণি ও দরিদ্রতম কৃষকদের হাতে ক্ষমতা আসবে'-এই উত্তরণ সংঘটিত করাই পার্টির কাজ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি চালানোই পার্টির কর্মনীতি। এমনকি ১৯০৫ সালে 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল ডেমোক্রেসির দুই কৌশল' শীর্ষক পুস্তিকায় লেনিন বলেছিলেন যে, জারতন্ত্র নিপাত ঘটাবার পর সর্বহারাশ্রেণি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের জন্য অগ্রসর হবে। যেটাকে আরও বিবৃত করে বলেছেন, 'সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কি' পুস্তিকায়। রুশ বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—'আমরা যা বলেছিলাম তাই সত্যি হয়েছে। বিপ্লবের গতি আমাদের যুক্তির নির্ভুলতা প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রথমে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, জমিদারদের বিরুদ্ধে আর মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'সমগ্র' কৃষকসমাজকে সঙ্গে নিয়ে (এবং সে পর্যন্ত বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে গণ্য হবে); তার পরে গরিব কৃষক আর আধা-শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে, সমস্ত শোষিত জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, গ্রামের ধনী কৃষক আর মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে এগোতে হবে; এবং এই অবস্থায় বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে। প্রথম আর দ্বিতীয় বিপ্লবের মধ্যে কোনো কৃত্রিম চীনের প্রাচীর খাড়া করার চেষ্টা করা; শ্রমিকশ্রেণির প্রস্তুতির পরিমাণ, গরিব কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের ঐক্যের পরিমাণ ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়ে দুই বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানার চেষ্টা করার অর্থ মার্কসবাদকে জঘন্যভাবে বিকৃত করা, তার জায়গায় উদারনীতিবাদকে স্থান দেয়া'। (লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলি, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১৯১)

আপাত অর্থে বিপরীত মনে হলেও এটা বিপরীত ছিল না। মার্কসের সময় পুঁজি অবাধ প্রতিযোগিতার স্তরে ছিল। পরবর্তীতে লেনিন দেখান যে, পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতামূলক স্তর অতিক্রম করে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির যুগে প্রবেশ করে ব্যাংক পুঁজি ও শিল্প পুঁজির মিলনের মধ্য দিয়ে লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়েছে। পণ্য রপ্তানির স্থলে পুঁজি রপ্তানি করাই সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়, লেনিন কর্তৃক পরিবর্তনের এ ব্যাখ্যা মার্কসবাদী বিজ্ঞানের একটা মৌলিক বিকশিত ধারণা। আবার দেশে দেশে বিপ্লব ও বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী বিজ্ঞান বিপ্লব সম্পর্কিত ধারণা নতুন নতুন পরিস্থিতিতে পড়ে মৌলিক না হলেও সংযোজন ঘটিয়ে চলেছে। তখনকার পরিস্থিতিকে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে লেনিন তার বক্তব্য উপস্থিত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিলেন। আরেকটি প্রবন্ধে তিনি দেখালেন যারা শুধুমাত্র বুর্জোয়া বা পুঁজির বিকাশ ঘটাতে হবে, কী মাত্রায় পুঁজির বিকাশ ঘটল, শিল্প কতখানি বিকশিত হল বা সর্বহারা শ্রেণি, শ্রেণি হিসেবে কতখানি সংগঠিত ও বিকশিত হলো এর উপর নির্ভর করে যারা বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করতে চান তারা অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদের সংকটে ভোগেন। তখন তিনি তার প্রবন্ধ লিখলেন 'মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয়'। যখন আমরা আমাদের দেশের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করব, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করব তখন এই বিষয়গুলো আমাদের আরও ভালো করে পড়া এবং জানা-বুঝা দরকার।

পুঁজিবাদের বিকাশ কি মাত্রায় হলে তার চূড়ান্ত বিকাশ বলে মনে করা হবে? পুঁজিবাদের অসম বিকাশের কারণে সব জায়গায় সমানভাবে বিকাশ হবে না। আবার সকল দেশে একই প্রক্রিয়াতেও হয় নাই। মার্কস বলেছিলেন উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বিপ্লব আগে হবে এবং কয়েকটি দেশ মিলে একসাথে বিপ্লব হবে। এটাকে ধরে ট্রটস্কি পরে হাজির করল বিশ্ব বিপ্লবের তত্ত্ব। আমরা যখন আমাদের দলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক বলেছিলাম, তখন আমাদেরকে অনেকে ট্রটস্কিবাদী বলল। ট্রটস্কি বলেছিল সারা দুনিয়ায় সকল দেশে বিপ্লবের একটাই মাত্র স্তর সেটা হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

উৎপাদন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্র চরিত্র আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আমাদের আলোচনা করতে হবে উৎপাদন কি? মানুষের জীবন নির্বাহের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেটা সৃষ্টি করাই হচ্ছে উৎপাদন। অর্থাৎ উৎপাদন হচ্ছে উপযোগ সৃষ্টি করা, যা মানুষের কোন না কোন অভাব পূরণে সক্ষম। এটা হয় শ্রম প্রয়োগে বস্তুর অসংখ্য রূপান্তরের মাধ্যমে। মানুষের জীবনধারণের জন্য চাই বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী। প্রাকৃতিক বস্তু বা প্রকৃতি থেকে আহরিত বস্তুর উপর বিভিন্ন হাল-হাতিয়ারের সাহায্যে মানুষের শ্রম প্রয়োগ করে দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করার প্রক্রিয়ার নামই উৎপাদন। প্রকৃতিতে রয়েছে বিভিন্ন বস্তু, আর মানুষের রয়েছে শ্রম করার শক্তি। আলাদা আলাদাভাবে এগুলো কিছুই করতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির বস্তু এবং মানুষের শ্রম শক্তি এই দুটো মিলিত হলে তবেই দ্রব্য সামগ্রী তৈরি হতে পারে। যেমন, কৃষক জমিতে (জমি-প্রাকৃতিক বস্তু) লাঙ্গল, ট্রাক্টর, কোদালের সাহায্যে চাষের শক্তি (মানব শ্রম) দিয়ে ধান, আলু, পটল (দ্রব্য/পণ্য) উৎপাদন করে। অথবা কাঠুরিয়া বনে গিয়ে (বনের গাছ যা প্রাকৃতিক বস্তু) কুঠার-করাত দিয়ে গাছ কেটে, সে গাছ থেকে কাঠ তৈরি করে, সে কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি আসবাবপত্র তৈরি করে। শ্রমিক তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড়, কাপড় থেকে জামা-প্যান্ট ইত্যাদি তৈরি করে। এটাই হলো উৎপাদন। প্রথমত, উৎপাদন পদ্ধতি কী? পুঁজিপতি মালিক ও শ্রমিক সম্পর্কিত হয়ে যে উৎপাদন সম্পন্ন হয়, তা হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি। এর আগে, জমিদার বা সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাস মিলে যে উৎপাদন সম্পন্ন হতো তা হলো সামন্তীয় উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি। আমরা দেখলাম উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক মিলে হয় উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা। তা হলে উৎপাদন শক্তি কী? উৎপাদন শক্তি হলো মানুষ যেখানে শ্রম দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে শ্রমের বস্তু বা ক্ষেত্র। যেমন, কল কারখানা, জমি, খনি এগুলো হচ্ছে শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র। শ্রমের ক্ষেত্র

হাতিয়ার এই দুইয়ে মিলে হয় উৎপাদনের উপায়। এর সাথে মানুষের কায়িক শ্রম এবং মানসিক শ্রম বা উৎপাদন সম্পর্কিত জ্ঞান এই মিলে হয় উৎপাদিকা শক্তি বা উৎপাদনের শক্তি। এখানে শ্রম বলতে বোঝানো হয়েছে শ্রমশক্তি বা প্রয়োগকৃত শ্রম, শ্রমিক উৎপাদনের জন্য যে শ্রম দিয়ে থাকে। শ্রম প্রয়োগের হাতিয়ার হচ্ছে উৎপাদনের হাল হাতিয়ার অর্থাৎ যা দিয়ে উৎপাদন করা হয়। যেমন: তাঁত যন্ত্র, সেলাই মেশিন, ট্রাক্টর, কাস্তে-হাতুড়ি, কম্পিউটার, লাঙল ইত্যাদি। তা হলে দাঁড়ালো শ্রম শক্তি + শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র + শ্রম প্রয়োগের হাতিয়ার বা শ্রমের উপকরণ + নব নব উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এই মিলে হলো উৎপাদিকা শক্তি। উৎপাদন সম্পর্ক কী? মানুষ যেহেতু একা একা উৎপাদন করতে পারে না, তাকে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। উৎপাদন হচ্ছে একটা সামাজিক প্রক্রিয়া, যা সম্পন্ন হয় সম্মিলিত কর্ম প্রয়াসে। যে কোন যুগেই যে কোন উৎপাদন পদ্ধতিতে মানুষ সমবেত হয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। উৎপাদনকে কেন্দ্র করে মানুষের পরস্পরের মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে তাই উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন, বিলিবণ্টন ও ভোগ এগুলো যে কোন সমাজের অর্থনীতির মূল কাজ। ফলে, উৎপাদন পদ্ধতি না বুঝলে সমাজটাকে বুঝতে পারবো না।

এর সাথে সমাজ বিকাশের ইতিহাসটাও আমাদের বোঝা দরকার। সমাজ বিকাশের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস মার্কস প্রথম আমাদের দেখিয়েছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, শ্রেণি সংগ্রাম এবং সমাজ বিকাশের ইতিহাস যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হিসেবে খ্যাত এগুলোই আমাদের বিশ্লেষণের হাতিয়ার। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ যেটাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজ হিসেবেও অনেকে বলে থাকে, সেখানে উৎপাদন পারস্পরিক শ্রম সহায়তামূলক পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হত, সেই সমাজ থেকে শুরু করে দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যে সমাজে আছি। রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া, লাউস, কিউবা, পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সামজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা একটা অন্তবর্তীকালীন সমাজব্যবস্থা, এটা কোন স্থায়ী সমাজব্যবস্থা না। পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজে যাওয়ার পথে একটা অন্তর্বর্তীকালীন ধাপ।

সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য কী কী এবং কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে এখানে উৎপাদন হত, দাস সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী কী এবং কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হতো, সামন্ত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য কী কী এবং কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হতো, এখন আমরা যে পুঁজিবাদী সমাজে বাস করছি তার বৈশিষ্ট্য কী কী এবং এখানে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হচ্ছে এগুলো জানতে পারলে আমরা জানতে পারব যে, কোন সমাজের চরিত্র বৈশিষ্টগুলো কী। কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে সমাজ পুঁজিবাদী হয়। কোন উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হলে আমরা বলতে পারব যে সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি চলছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক, জনগণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট পার্টি যে বলে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তর সেটাও মূলত, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই একটা রূপ। রাষ্ট্রের চরিত্র ও রাষ্ট্রের উৎপাদন সম্পর্ক আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারলেই শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করতে পারব, বিপ্লবের স্তর সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারব। বিপ্লব করতে হলে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করা খুব প্রয়োজন। আমরা বলছি রাষ্ট্র যদি পুঁজিবাদী হয় তাহলে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আছে এবং তারাই আমাদের প্রধান শত্রু। আমাদের মিত্র হবে সকল সর্বহারা, আধা সর্বহারা, শ্রমিক-কৃষক এর দৃঢ় মৈত্রী এবং পেটিবুর্জোয়া শক্তি হবে আমাদের দোলায়মান মিত্র। আমাদের বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা এই দেশেও যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে তাতে নেতৃত্ব দিয়েছে দেশের বুর্জোয়ারা। তাদের সাথে সর্বহারারাও ছিল। তারাও সামন্তবাদকে উচ্ছেদের লড়াইয়ে থাকে। সর্বহারাদের মিত্র হয়েই বুর্জোয়ারা এখানে সামন্তবাদ উচ্ছেদের লড়াই করে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হলে সেই বিপ্লবে উপনিবেশিক শক্তি ও সামন্তবাদী শক্তি উভয়কেই উচ্ছেদ করতে হবে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে দলগুলো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন নির্ধারণ করেছে তারা বলে আধা পুঁজিবাদ ও আধা সামন্তবাদ, এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণি নেতৃত্ব দেবে এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত বুর্জোয়ারা মিত্র শক্তি হিসেবে কাজ করবে। চীনেও যেমন আধা সামন্তবাদ-আধা উপনিবেশবাদ উচ্ছেদে সান ইয়াৎ সেনদের সাথে একটা পর্যায় পর্যন্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যৌথ আন্দোলন করেছে। এই রাজনৈতিক লাইনের কারণে আমাদের দেশের বামপন্থি পার্টিগুলো রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় বুর্জোয়াদের সাথে ঐক্য করতে চায়। একেক সময় একেক বুর্জোয়াদের দিকে তাদের ঝোঁক তৈরি হয়। এই প্রবণতা সবসময় শুধু স্বার্থ সুবিধার প্রবণতা না, তাদের রাজনৈতিক লাইন, আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্লেষণই তাদের এই প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়।

আজকের এই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের যুগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় মুক্তির যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে হওয়া সম্ভব না, যদি সম্ভবও হয় সেটা আধাখেচরা হবে, পুরোপুরি সম্পন্ন হতে পারে না। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেক কাজ অপূরিত থেকে যাবে। যেমন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরে সংবিধানে আমরা সেক্যুলারিজমের কথা লিখলাম কিন্তু চর্চা কি করতে পারছি? রাষ্ট্রের দিক থেকে সেটা চর্চার কোন বাধ্যবাধকতা আছে? তারমানে এটা হলো যুগের সীমাবদ্ধতা। বুর্জোয়ারা উত্থানের যুগে যে সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের স্লোগান দিয়েছিল, সেই সাম্যের স্লোগান আজ তারা দিতে পারে না, দিলেও কার্যকর করতে পারে না। মৈত্রীর স্লোগানের বাস্তবায়ন তারা করতে পারে না। বুর্জোয়াদের উত্থানের কালে ফরাসি বিপ্লবের সময়ে বুর্জোয়াদের আপেক্ষিক যে প্রগতিশীল চরিত্র ছিল আজকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয়ের যুগে তারা প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ধারণ করেছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়ে তারা যে গণতন্ত্রের কথা, নৈতিকতার কথা

বলেছে আজ তারা সেগুলো আর রক্ষা করতে পারছে না। আমাদের দেশেও বুর্জোয়ারা যে অধিকারগুলোর কথা বলেছিল আজ আর সেই অধিকারগুলো তারা দিতে পারছে না বরং অধিকারগুলো খর্ব করে চলছে একের পর এক। শুধু আমাদের দেশেই না আমেরিকা, ইংল্যান্ড যাদেরকে গণতন্ত্রের সুতিকাগার বলা হয় সেখান থেকে শুরু করে সকল দেশেরই, এমনকি পাশের দেশ ভারত যারা সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের ধারক বলে প্রচার করে। সকল জায়গায় একই অবস্থা। শুধু তাই নয়, নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পথ সেই পথও আজ আর রক্ষা করতে পারছে না তারা। অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে স্লোগান সেগুলো তারা আর জারি রাখতে পারছে না। তাদের ন্যূনতম মূল্যবোধও তারা টিকিয়ে রাখতে পারছে না।

আমাদের দেশের অনেক বামপন্থি দলের বিপ্লবের স্তর এখনও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। কেন? কারণ তারা মনে করে, দেশে এখনও পুরোপুরি না হলেও আধাআধি কিংবা শক্তিশালী অবশেষ নিয়ে সামন্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে সাম্রাজ্যবাদের পুতুল সরকার মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বা দালাল বুর্জোয়ারা। এদের উচ্ছেদ করে জাতীয় স্বাধীনতা আনতে হবে এবং একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তার পর একে টেনে সমাজতন্ত্রে নিয়ে যেতে হবে। আমরা বলেছি, ১৯৭১ সালে বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে আধাকাচড়া হলেও এখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে। কারণ, পুঁজিবাদের প্রগতিশীলতার যুগে বুর্জোয়ারা যে মাত্রায় যতটুকু বিপ্লবী কর্মকাণ্ড করতে পেরেছিল এখন প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগে তারা আর সেরকম করতে পারবে না। এরা দিনে দিনে আরও প্রতিক্রিয়াশীল হবে। আজকে তারা বুর্জোয়া অর্থব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানিক আয়োজন, সংস্কৃতির বিকাশকে আধুনিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে না। কেউ কেউ শ্রেণি চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগ হচ্ছে মুৎসুদ্দি বা সাম্রাজ্যবাদের দালাল বুর্জোয়া এবং এরা সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল। আবার কমিউনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন এদের মধ্যে একটা অংশ প্রগতিশীল এবং আরেকটা অংশ হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল। স্বাধীনতার পরে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে ছিল তাই সে সময় প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের সাথে মিলে অসম্পূর্ণ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণতায় নিয়ে সমাজতন্ত্রে যাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রগতিশীল বুর্জোয়ার সাথে থেকে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অংশ নিয়ে বুর্জোয়া বিপ্লবের করণীয় কাজগুলো সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে। প্রগতিশীল উপাদান কী? সেটা হচ্ছে শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সহনীয় পর্যায়ে কিছু অবস্থান নেয়া, সমাজতন্ত্রের কথা বলা ইত্যাদি। সে তত্ত্বের ভিত্তিতে বুর্জোয়া একনায়কতান্ত্রিক বাকশালেও তারা যোগ দিয়েছিল। এখন অবশ্য সেটা যে ভুল পদক্ষেপ ছিল তা তারা স্বীকার করছেন। তবে আমরা যেভাবে বিচার বিশ্লেষণ করি তাদের জায়গা ঠিক সেরকম নয়। পিকিংপন্থি নামে যারা চিহ্নিত ছিলেন তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে আওয়ামী লীগ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল, মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া মানে সাম্রাজ্যবাদের কমিশন এজেন্ট। এরা স্বাধীন বুর্জোয়া নয়, এরা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করার বিনিময়ে সুবিধা ভোগ করে কমিশন ভোগ করে। যারা নিজের দেশে স্বাধীনভাবে বুর্জোয়াদের স্বার্থে কাজ করে তারা হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি। স্বাধীনতার পর থেকে যারা শাসন ক্ষমতায় এসেছে বা আছে তারা কেউ জাতীয় বুর্জোয়া নয়। এরা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এরা সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক দেশীয় দালাল বুর্জোয়াদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করে। আমরা বলেছি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও এরা জাতীয় বুর্জোয়া। এদের গঠনকালীন বক্তব্য, ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সব কিছু মিলে এরা বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে ও স্বার্থে প্রধানত রাজনীতি করে। তারা পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য তাদের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রকে সেভাবে পরিচালিত করে। কথা হলো বুর্জোয়াশ্রেণিকে যে কোণ থেকেই দেখি না কেন, এদের সাথে যোগসাজস করে শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থ রক্ষা হবে না, সমাজতন্ত্রের পক্ষে অগ্রসর হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বুর্জোয়া বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজও সমাপ্ত করা যাবে না। এ যদি হয় উপলব্ধি তা হলে বিপ্লবের স্তর নিয়ে বিভ্রান্তিতে না ভুগে, বিপ্লবের লক্ষ্যে সংগ্রাম অগ্রসর করতে করতেই বিভ্রান্তি কাটবে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছে রণনীতি এবং রণকৌশলের ধারণা বলতে কী বোঝায়? নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস থেকে এখনো দেশে দেশে কমিউনিস্টরা সেই পাঠ গ্রহণ করছে। রণনীতি একটা দীর্ঘকালীন সময়ের বিষয়, যা কেবলমাত্র অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটলেই পরিবর্তিত হয়। অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট যুগে বা কালপর্বে রণনীতি বাস্তবায়নে আন্দোলনের জোয়ার এবং ভাটার সাপেক্ষে নির্ধারিত হয় রণকৌশল। অর্থাৎ যুদ্ধের নীতি ও যুদ্ধ পরিচালনা কৌশলই হলো রণনীতি-রণকৌশল। এ বিষয়ে কমরেড স্তালিন বলেছেন, যেহেতু এই সমস্ত উপাদানগুলি এক বাক থেকে অন্য বাকের মাঝে পড়ে যায় ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হয়. সে কারণে সমগ্র যুদ্ধকে পরিব্যপ্ত না করে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এমন একটি নির্দিষ্ট লড়াই সাপেক্ষে সে বিশেষ পর্বে রণকৌশল অসংখ্যবার পরিবর্তিত হয় বা হতে পারে।

আজকের বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা কর্পোরেট পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এখন কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ বুঝতে হলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্যটা বোঝা দরকার। লেনিন তার একাধিক রচনায় এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেলন, 'ব্যক্তি মালিকানা এবং উদ্বৃত্ত শোষণ এই দুই ব্যাপারে সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের সাদৃশ্য থাকলেও জমির মালিকানার চরিত্র, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদিকা শক্তির অবস্থা এই চারটি বিষয়ে দুই ব্যবস্থায় মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

এই বুর্জোয়া ব্যবস্থায় শিল্পের বিকাশ আমাদের দেশে যটটুকু হওয়ার কথা ছিল সেটা তারা করতে পারে না তাদের সেই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার কারণেই। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করবে হয় দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার নয়তো দেশের বাইরের বাজারে। কিন্তু এদের দেশের অভ্যন্তরেও বাজার নাই দেশের বাইরেও নাই। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির জন্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। সেটা করার জন্য যে ন্যূনতম মজুরি দরকার সেটা দিচ্ছে না। তাহলে শিল্পের বিকাশ ঘটবে কীভাবে? তাই যে মাত্রায় বিকাশ হওয়ার কথা ছিল সেই মাত্রায় হয় নাই, একটা স্তর পর্যন্ত হয়েছে। সেটা আমাদের বাজেটের আকার, জিডিপির আকার দেখলে বোঝা যায়। স্বাধীনতার পরে যেমন ছিল তার চেয়ে কয়েকগুণ বড় হয়েছে এখন। অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি অনেক শক্তিশালী হয়েছে। একটা পর্যায় পর্যন্ত এটা হয়েছে, কিন্তু বেশিদূর যাবে না। স্থবিরতায় সে পড়বেই। কারণ মানুষের কেনার ক্ষমতা না বাড়লে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ক্রমাগত সংকুচিত হবে। এর কারণে বাইরের বাজারও সংকুচিত হবে। দুইটা বাজারই যদি সংকুচিত হয় তাহলে শিল্পের বিকাশ ঘটবে না, কলকারখানা স্থাপন হবে না। তারপরও আমাদের দেশের পুঁজি বাজার অনেক বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে। অনেকগুলো কলকারখানা এখানে তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার পর আমাদের ৮০টা রাষ্ট্রীয় পাটকল ছিল। এখন সবগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয়গুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ২০০-২৫০টি ব্যাক্তিমালিকানাধীন পাটকল নতুন তৈরি হয়েছে সেটা অনেকে দেখতে পাচ্ছে না। পাট পণ্য রপ্তানি হচ্ছে, পাটের রপ্তানি আয় বাড়ছে। তার মানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাক্তিমালিকানাধীন শিল্প সম্প্রসারিত হচ্ছে। এভাবে প্রত্যেক সেক্টরেই হচ্ছে। গার্মেন্টস এরও একটা প্রসার ঘটেছে। দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভারী শিল্প চট্টগ্রাম স্টীল মিল বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বেসরকারি BSRM, KSRM-সহ অনেক স্টিল কারখানা গড়ে উঠেছে। জাহাজ ভাঙা এবং জাহাজ প্রস্তুত কারখানা তৈরি হয়েছে বেসরকারি খাতে। শিল্প, শিল্পের রূপ, শিল্পের চরিত্র সম্পর্কে আগে যে সংজ্ঞা ছিল এখন সেটা নাই। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিল্পের বিকাশ অর্থাৎ কৃষি, শিল্প অর্থনীতিতে পুঁজির বিকাশ কতখানি হচ্ছে সেটা নিয়ে আরও বিস্তারিত ও গভীর আলোচনা করা দরকার।

আমাদের দেশে কৃষি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক ছিল। বর্গা প্রথা, ইজারা প্রথা থেকে শুরু করে এসকল বৈশিষ্ট্য ছিল বলে কৃষিতে সামন্তবাদ আছে এটা বলা হতো। কারণ এগুলো সামন্তসমাজের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠা সময় থেকে আমরা বলে এসেছি এগুলো কৃষির চরিত্র নির্ণয়ে প্রধান বিষয় হতে পারে না। প্রধান বিষয় হলো উৎপাদন কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে, উৎপাদনের লক্ষ্য কি এবং তার গতিমুখ কোনদিকে সেটা দিয়েই কৃষির চরিত্র নিরূপণ করতে হবে। এখন বর্গাপ্রথা আগের মতো বাধ্যতামূলক চিরায়ত নেই, এটা এখন চুক্তিভিত্তিক পর্যায়ে চলে এসেছে। এখন কৃষক জমির মালিকের সাথে দেনদরবার করে, কে কত বিনিয়োগ করবে, ফসল কে কত অংশ পাবে এর ভিত্তিতে জমি বর্গা নেয়। যদি বর্গাচাষির লাভের সম্ভাবনা থাকে সে জমি চাষ করে না হয় করে না। চুক্তিভিত্তিক বর্গা সামন্তীয় বৈশিষ্ট্য নয়। এখন উল্টো বর্গা প্রথাও চালু হয়েছে। বর্গা চাষ এখন লিজ সিস্টেম হয়ে গিয়েছে। তারা কন্ট্রাক্টে দিয়ে দেয়। এক বছর চাষ করলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হবে। হাট ইজারাও আগের মত নাই। ডিসিরা এখন বড় বড় হাট ইজারা দেয়। এগুলো সামন্তীয় বৈশিষ্ট্য নয়। এগুলো রাষ্ট্রীয় আয়োজনে ও নিয়ন্ত্রণে ইজারা দেয়া হচ্ছে। প্রশাসনের উদ্যোগেই রাজস্ব আয়ের উপায় হিসেবে এই ইজারা ব্যবস্থা আছে। আরেকটা কথাও তারা বলছে, কৃষি মজুর মাসভিত্তিক, বছরভিত্তিক প্রথাগত ধারার মাধ্যমে কাজ করে। আমরা বলছি, এখন আর এরকম ব্যবস্থা চালু নেই। অনেক ক্ষেত্রে বর্গা চাষীরা বর্গা চাষ করতে চাচ্ছে না, জমি পড়ে থাকছে। সামন্তবাদে বর্গা চাষীরা বর্গা চাষ করতে বাধ্য ছিল। বাধ্য শ্রম আর নাই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সামন্তবাদে উৎপাদন হয় ভোগের জন্য আর পুঁজিবাদে উৎপাদন হয় মুনাফার জন্য। বলা হয় কৃষকরা যে চাল উৎপাদন করে তার বেশিরভাগ সে ভোগ করে। তাহলে যে চাল উৎপাদিত হয় সেটা যদি ভোগে যায়, এটাতো পুঁজিবাদের লক্ষণ না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, চালটা জাতীয় বাজারের পণ্য কিনা? এই চাল দ্রব্য হিসেবে ভোগও করতে পারে আবার বিক্রি করতে পারে পণ্য হিসেবে। চাল বাংলাদেশের যে কোন বাজারে বিক্রি করা যায় কিন্তু সামন্তবাদী ব্যবস্থায় ইচ্ছা করলে যে কোন বাজারে সেটা বিক্রি করতে পারে না এবং তা জাতীয় বাজারের পণ্য হয় না। তাছাড়া এখন বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন হচ্ছে মূলত মুনাফার উদ্দেশ্যে। প্রমান রাতারাতি ধানচাষের জমিতে ভুট্টা চাষ, পাহাড়ে জুম চাষের জমিতে তামাক চাষ ইত্যাদি। একটা সমাজ থেকে আর একটা সমাজে সম্পূর্ণ পরিবর্তন তো রাতারাতি হয়ে যায় না। তার কিছু অবশেষ থাকে। সেটা বস্তুগত ক্ষেত্রেও যেমন থাকে আবার ভাবগত ক্ষেত্রে, মানুষের সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, রুচি, অভ্যাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে পূর্বের সমাজের রেশ থেকে যায়। এটা প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে সঠিক বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে দেখা যাবে সকল খাতেই উৎপাদন এর চরিত্র পুঁজিবাদী।

রাষ্ট্র চরিত্র নির্ধারণে পুঁজির নির্ভরতার প্রশ্নও এসেছে। আগে বাংলাদেশের কথিত উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ)-এর বৈঠক হতো প্যারিসে। বাংলাদেশের উন্নয়নের কৌশল, পরিকল্পনা, অর্থায়ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো প্যারিস কনসোর্টিয়ামে। বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রীরা সেখানে গিয়ে বসে থাকতো, টাকার জন্য। '৮০-র দশকে অবস্থা যে রকম ছিল এখন আর অবস্থা আগের মতো নেই। আমরা বলেছিলাম বুর্জোয়ারা যদি বিদেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ও এই নির্ভরতার দুইটা দিক আছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের পুঁজি খাটাতে চায়, কিন্তু খাটাতে পারছে না, তারা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের মাধ্যমে সে পুঁজি খাটায়। বাজার

ধরে রাখতে ও বিস্তৃত করতে তৎপর থাকে, এটা বুর্জোয়ারা জেনেই সেখানে যায়। আবার বুর্জোয়ারা নির্ভরতা কমিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করে এবং নিজ দেশের বুর্জোয়াকে শক্তিশালী করে। আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা এখন আগের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের উপর অতবেশি নির্ভর করে না। এ বুর্জোয়ারা দিনে দিনে এখন অনেক আত্মনির্ভরমুখী। যদিও এ যুগে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বাইরে কোন পুঁজিবাদই টিকে থাকতে পারে না। এখানে দরকষাকষি যেমন থাকে তেমনি অসম লেনদেনের গাঁটছড়াও থাকে। বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার মতো বাংলাদেশেও বিতর্ক আছে, এখানে কোন শ্রেণি বিপ্লব করবে? বাংলাদেশে কী শক্তিশালী পুঁজিবাদ আছে?। এখানে শিল্পের বিকাশ হয় নাই, শ্রমিক শ্রেণিও বিকশিত হয় নাই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী মূল শক্তি যেহেতু বিকাশমান শ্রমিক শ্রেণি সেহেতু এখানে কী ধরনের বিপ্লব হবে। এখানে যেটা দেখা দরকার, সমাজে শ্রমিকরা সংখ্যায় কত, কৃষকরা কত? এখন সমাজে অগ্রসরমান শ্রেণি কোনটা? শ্রমিক, কৃষক নাকি পেটি বুর্জোয়া? সে জায়গায় এসে সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন সমস্ত জায়গায় শ্রমিকশ্রেণিই সামনে চলে এসেছে।

গত ১৪ বছর ধরে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থেকে শ্রমজীবী-মেহনতি সাধারণ জনগণের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য যা যা করণীয় তাই করছে। পুঁজিবাদ মানে মুনাফা। তাই মুনাফার স্বার্থে যা যা করা দরকার তাই করবে। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যে সরকারই এসেছে তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে এখানকার ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থেকে শাসন প্রশাসনে সকল জায়গায় অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে গিয়ে দেশে পরিচালনা করছে। সংবিধানে অনেক ভালো ভালো কথা লেখা থাকলেও সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক কালো আইন, রাষ্ট্রধর্মসহ অনেক বিষয় নিয়েই তারা দেশ পরিচালনা করছে। যখন নির্বাচন আসে, রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা বা যাওয়ার বিষয় আসে তখন তারা বলছে সংবিধানের বাইরে কিছু করতে পারবে না। সংবিধান মেনে তাদের চলতে হবে। অথচ প্রতিনিয়ত তারা সংবিধান লংঘন করে দেশ চালাচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় যে জনগণের বিক্ষোভ হলো, এত বড় আন্দোলন হল তাও শেষ পর্যন্ত চোরাগলিতে চলে গেল। রাজাপাকসে গিয়ে রণিল বিক্রমাসিংহকে এনেছে আবার দীনেশকে এনেছে। এরা সবাই রাজাপাকসে পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ। রণিল আর দীনেশ আবার সহপাঠী ছিল স্কুলে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের অভিনন্দন বার্তা দেয়া হচ্ছে। বিক্ষোভকারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বল প্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হচ্ছে। বিক্ষোভ দমন করার চেষ্টা চলছে। এখানেও পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শাসনকে আপেক্ষিক অর্থে টিকিয়ে রাখা এবং স্থায়িত্ব ধরে রাখার চেষ্টা চলছে। ভারতেও একই কাজ চলছে। হিন্দুত্ববাদকে উস্কে দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা ও পুঁজিবাদী শোষণ লুণ্ঠন জারি রাখার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশের সরকারও এ ধরণের চেষ্টা করে যাচ্ছে ফ্যাসিবাদী, স্বৈরাচারী, কর্তৃত্ববাদী শাসন পরিচালনা করে। এটা ছাড়া আজকের দিনে কোন দেশেই বুর্জোয়াদের পক্ষেই বুর্জোয়া শাসন কায়েম রাখা সম্ভব না।

আমেরিকাতেও ট্রাম্প নানাভাবে চেষ্টা করেছে ক্ষমতায় আসতে। শেখ হাসিনা সরকারও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে নানা আয়োজন করছে। আলোচনা যে নির্বাচন নিয়ে সেই নির্বাচন ব্যবস্থাই তো ভঙ্গুর। নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর মানুষের আস্থা নাই। নির্বাচনে শুধু ভোট দিতে পারলেই হয় না, নির্বাচন সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, অবাধ ও জনমতের প্রতিফলন হওয়ার জন্য যে ধরণের রাজনৈতিক সচেতনতা দরকার জনগণের মধ্যে সেই সচেতনতা তৈরির কোন উদ্যোগ নাই। জনগণ টাকার কাছে ভোট বিক্রি করে দেয়। সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাও নানাভাবে কাজ করে। এগুলো সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। আমরা মনে করি এগুলো কাটানো দরকার এবং তারজন্য প্রতিনিয়ত মানুষকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা দরকার। মানুষকে রাজনীতির মধ্যে নিয়ে আসা দরকার, রাজনৈতিকভাবে সচেতন করা দরকার। মানুষকে যত অন্ধকারে রাখা যায় তত শাসন করা, শোষণ করা সহজ হয় এবং ক্ষমতাকে স্থায়িত্ব দেয়া যায়। ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ সিটে নির্বাচিত হয়েছে। সরকার গঠনে দরকার ১৫১ জন। ফলে আর কোন আসনে নির্বাচন করার দরকারই পরে না। এ কারণে এটাকে সুষ্ঠু ভোট বলে না। কারণ মানুষ ভোট দিতে পারে নাই এবং ভোট দেয়ার প্রার্থীও নাই। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না এটাতো হতে পারে না। হয় মানুষের ভোটের প্রতি বিরক্তি তৈরি হয়ে গিয়েছে নয়তো নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়েছে। বাস্তবে এটা ছিল না কিন্তু জোর করে এটা তৈরি করা হয়েছিল। আর ২০১৮ সালে সেই প্রক্রিয়ায় করতে পারে নাই অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে অর্থাৎ দিনের ভোট রাতে করতে হয়েছে। আমলা, প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে তারা ভোটের বাক্স রাতেই অর্ধেকের বেশি পূরণ করে রাখল। এটা শুধু সরকার পরিবর্তনের নির্বাচনে করছে এমন না, স্থানীয় নির্বাচনেও একই রকম করছে। ফলে আজ শাসকেরা একদিকে মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে। অন্যদিকে মানুষের মৌলিক-গণতান্ত্রিক অধিকারও নির্বাসনে পাঠিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় ফ্যাসিবাদি দুঃশাসনের অবসান, ভোট-ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাসদের পতাকাতলে সকল শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাসদকে শক্তিশালী করে অপরাপর বাম-প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল-ব্যক্তি গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটাতে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ সংগ্রামে বাসদের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সর্বোচ্চ মেধা খাটিয়ে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই।